গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৪ সংখ্যা-৩ মে-জুন ২০১৭ RNI No.WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

❑ ভালো বাসার জন্য ৬ ❑ ধারাবাহিক : ডা: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২
❑ রাতের আকাশে আঁধার কেন? ৪ ❑ ড: তারকমোহন দাস ৫ ❑ খাদ্যে ভেজাল ৬ ❑ অঙ্ক ৭ ❑ কুসংস্কার ৮ ❑ সোয়াইন ফ্লু ৯ ❑ স্বাস্থ্য ১০ ❑ সংবাদ ১৩
❑ জানো কি? ১৩ ❑ মহাকাশ ১৪ ❑ কবিতা/কার্টুন/শব্দের খোঁজে ১৬

আমাদের কথা

"যে ভাষা মানুষ বোঝে, সেই ভাষায় কথা বললে তা তার মগজে ঢুকবে। যদি তার নিজের ভাষায় বলা হয় তবে তা প্রবেশ করবে হৃদয়ে।" —নেলসন ম্যান্ডেলা

উন্নয়নের নামে, অসংখ্য বৃক্ষের 'কচুকাটা' দেখতে দেখতে, বায়ু-জল-মাটির বিষ দূষণের কবলে পড়ে, বাজি-ডি.জে. শব্দ দানবের আক্রমণে অতিষ্ট হতে হতে, চোখের সামনে ছোট বড় জলাশয়ের মৃত্যুতে যখন একটা হতাশা আমাদের ঘিরে ধরেছে, তখন একটি খবর একঝলক আনন্দের স্পর্শ দিয়ে গেলো। রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য করছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বসুর মত বরেণ্য বিজ্ঞানীরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যে ভাষায়, পারস্পরিক যোগাযোগের প্রাত্যহিক যাতায়াত, সেই ভাষার চর্চাও জরুরী। শিশুর মননের পুষ্টির জন্যও মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ। একটি জাতির সংস্কৃতির শিকড় হচ্ছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বিজ্ঞানের যুক্তি চিন্তা পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানকে বুঝতে সহজ করে। তাই, বাংলা ভাষায় সমস্ত রকমের চর্চাকেই আমরা স্বাগত জানাই।

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাজদীপ ভট্টাচার্য্য

শেষাংশ

১৯৭৮ সালে যেদিন ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাফল্যের কথা সর্বসমক্ষে জানিয়েছিলেন তারপর দীর্ঘপথ ফেলে এসেছি আমরা। অনেক পরিবর্তন, নতুন আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করেছি সকলে। তবু আজও কেন আমরা সুভাষবাবুর কথা মনে রাখবো। ঠিক কী করেছিলেন তিনি?

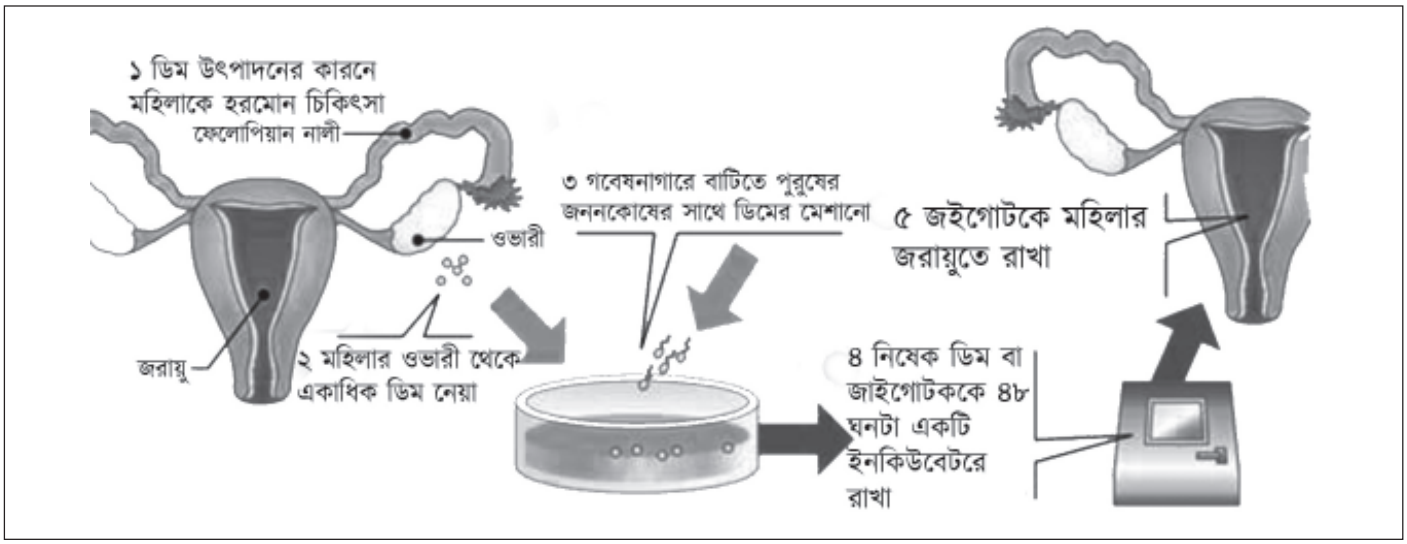

পরীক্ষাগারে নিষেক পদ্ধতি (In vitro fertilization)

সুভাষবাবুর সৃষ্টি অর্থাৎ 'দুর্গা' বা কানুপ্রিয়া অগ্রবালের জন্মের ৬৭ দিন আগে অর্থাৎ ২৫শে জুলাই ১৯৭৮, রাত্রি ১১টা ৪৫মি. নাগাদ ইংল্যাণ্ডের ওল্ডহাম জেনারেল হসপিটালে জন্ম হয় বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি লুইস জয় ব্রাউনের। বৈজ্ঞানিক স্রষ্টা রবার্ট এডওয়ার্ড এবং সহযোগী প্যাট্রিক স্টেপটো। এক্ষেত্রে তাঁরা ল্যাপ্রোস্কোপের সাহায্য নিয়ে মা'-এর শরীর থেকে ডিম্বানু সংগ্রহ করেন। একটি ছোট পাত্রে শুক্রানুর সাহায্যে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করে পুনরায় তাকে মাতৃজঠরে স্থান দেন।

কিন্তু সুভাষবাবুর পথ অনেক দিক থেকেই ভিন্নতর। দুর্গার প্রকৃত পিতার বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম। এই সমস্যা দূরীকরণে সুভাষবাবু গোনাডোট্রপিক হরমোন ব্যবহার করেন। বর্তমান কালে এই চিকিৎসা বহুল প্রচলিত। দুর্গার মা' এর ফ্যালোপিয়ান টিউব ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। এইসব কারণে স্বাভাবিক ভাবে সন্তানবতী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ডিম্বানু সংগ্রহের পূর্বে মিসেস অগ্রবালকে ড. মুখোপাধ্যায় HMG (Humal Menopausal Gonadotropins) দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মে চিকিৎসা করেন। এক্ষেত্রে মোট ৭৬টি অ্যাম্পুল ব্যবহার করে মাকে ডিম্বানু সংগ্রহের উপযুক্ত (Ova-

rian Stimulation) করে তোলা হয়। সেই সময়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকলেও বর্তমানে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। HMG'এর এরূপ ব্যবহারের কৃতিত্ব যায় USA-এর বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড জোনস্'-এর দখলে, যিনি সুভাষবাবুর তিন বছর পর এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

রবার্ট এডওয়ার্ডের মতো ল্যাপ্রোস্কোপ ব্যবহার করে অযথা জটিলভাবে ডিম্বানু সংগ্রহ না করে সুভাষবাবু জরায়ু থেকে একটি সামান্য অপারেশনের (Posterior Colpotomy) সাহায্যে সহজেই ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বানু সংগ্রহ করেন। পরবর্তী কালে সুভাষবাবুর দেখানো পথই এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে।

সংগৃহীত ডিম্বানু ৪ ঘণ্টা ইনকিউবেটেড অবস্থায় রাখা হয়। তারপর তাকে বিশেষ দ্রবণে প্রস্তুত করা (Protein-supplemented Tyrodes solution) বীর্যের সাথে মিলিত করা হয়। এভাবে বীর্যের প্রস্তুতি করণ সে সময়ে অজ্ঞাত থাকলেও বর্তমানে একটি আবশ্যিক পদ্ধতি। এইভাবে অপরিণত ভ্রূণকে ২৪ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ৭২ ঘণ্টা সার্ভিকাল-ইউটেরাইন ফ্লুইডের মধ্যে ইনকিউবেটেড অবস্থায় রাখা হয়। পরিশেষে একটি রিএজেন্ট (DMSO) ব্যবহার করে ভ্রূণকে হিমায়িত করে ফেলা হয়। ৫৩ দিন এভাবে সংরক্ষণের পর তাকে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে মিসেস অগ্রবালের স্বাভাবিক ধাতুচক্রকে অনুসরণ করে তার জরায়ুতে ভ্রূণের পুনর্স্থাপন ঘটানো হয়। এভাবে ভ্রূণকে হিমায়িত করা ও তাকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার কাজেও ড. মুখোপাধ্যায় পথিকৃৎ। যদিও এই কৃতিত্ব যায় ১৯৮০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের কাছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাউনসন।

তাই একথা বলাই যায় যে, ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ করে আচমকা কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেননি। বরং তাঁর পথ ছিল পূর্ববর্তী টেস্ট টিউব বেবির আবিষ্কর্তাদের তুলনায় অনেক সুরক্ষিত, নিরাপদ ও অধিক সম্ভাবনাময়। তাই তিনি একা যেসব নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি খুঁজে পেতে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলির বহু উর্বর মস্তিষ্ককে অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও তাঁর স্বীকৃতি পাননি ড. মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে অনেক জল বয়ে যায় গঙ্গায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসে। ১৯৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট ড. টি. সি. আনন্দ কুমারের নেতৃত্বে 'হর্ষ' ভারতের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি রূপে স্বীকৃত হয়।

আমরা হয়ত ভুলেই যেতাম সুভাষবাবুর কথা। কিন্তু আগুন তো ছাইচাপা থাকে না চিরকাল। সত্য কোন না কোন ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় একদিন। তবে এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জানাতে হয় ড. টি. সি. আনন্দ কুমার এবং সুভাষবাবুর সহযোগী ড. সুনীত মুখোপাধ্যায়কে। সুনীতবাবুর সক্রিয়তায় ১৯৯৭ সালে সুভাষবাবুর আবিষ্কার বিষয়ক যাবতীয় তথ্য ড. কুমারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি সময় নিয়ে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। তারপর সশ্রদ্ধায় ভারতবর্ষের প্রথম টেস্টটিউব বেবি'র জনকরূপে যে মুকুট তাঁর নিজের মাথায় উঠেছিল তা খুলে নিয়ে পরিয়ে দেন ভাগ্যতাড়িত, একসময়ে 'fraud' রূপে পরিচিত এক অগ্রজ বিজ্ঞানীর মাথায়, যাঁর নাম ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ব তাঁকে নতুন করে চেনে।

Indian Council for Medical Research (ICMR) ২০০২ সালে ১২ সদস্যের এক কমিটি গঠন করে সুভাষবাবুর নাকচ হওয়া দাবিকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য। ২০০৩ সালে কমিটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যকে সত্যরূপে ঘোষণা করে। ২০০৮ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবিষ্কার অবশেষে সরকারি সিলমোহর অর্জন করে।

সেদিনের 'দুর্গা' অর্থাৎ কানুপ্রিয়া অগ্রবাল তার ২৫তম জন্মদিনে সর্বসমক্ষে হাজির হয়ে বলেন 'I feel justice has been done to my scientific dad.' এতদিনের দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে দুর্গা'র মুখে ধ্বনিত হয় 'I am not a trophy but I am proud to be the living example of work of a genius'। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরু শহরে ICMR কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কানুপ্রিয়া এবং সুভাষবাবুর একমাত্র জীবিত সহযোগী ড. সুনীত মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করা হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতার মাঝে সুভাষবাবু একজন বিস্ময়। এরূপ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের জন্য সভ্যতা অপেক্ষা করে থাকে। এঁরা আসেন মানুষের অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণের পথ সুগম করে তুলতে। তাই তো সমসাময়িক কাল তাঁকে মেনে নিতে পারে না। তাঁকে প্রকৃত মূল্যায়ন করতে কেটে যায় দীর্ঘ সময়। ২০১০ সালে রবার্ট এডওয়ার্ড যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাঁর অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তখন আমাদের মনে পড়ে প্রায় সমসময়ে কিন্তু অনেক আধুনিক ও সুরক্ষিত পথে একই আবিষ্কার করেও বঞ্চিত রয়ে গেলেন ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে প্রায় পঙ্গু বিরহদীর্ণ নমিতা মুখোপাধ্যায়ের সাথে আপামর বাঙালির হাহাকার কেঁদে বেড়ায় সরকারি ফাইল, লালফিতের বাঁধন আর অসূয়া জীর্ণ নিয়মতান্ত্রিক সমাজের আনাচে কানাচে। সুভাষবাবুর ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন মূর্ত হয়ে ওঠে সিনেমার পর্দায় (এক ডক্‌তর্ কি মত্তত-তপন সিংহ) কিংবা উপন্যাসের পাতায় (অভিমন্যু-রমাপদ চৌধুরী)।

তবু এটুকু ভালোলাগা আমাদের সঙ্গী হয় যে আজ একথা প্রমাণিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দাবী 'bogus' ছিলো না। তাইতো W.F. Bynum, Helen Bynum প্রমুখের সম্পাদনায় 'Dictionary of Medical Biography'-তে ১০০টি দেশের কৃতি ১১০০ চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মাঝে তিন কোলকাতাবাসীর অন্যতম ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আমাদের আরাম দেয়। অন্য দুজন হলেন স্যার রোনাল্ড রস এবং স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১৯৮৭ সালে 'ICMR' এর সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ড. বদ্রী এন. সাক্সেনা বলেছিলেন—

'It is indeed the dedication, hard work and perseverance of Late Dr. Subhas Mukherjee which allowed him to obtain the first test tube baby in India. Like anything new in life people always criticise people always doubt. But truth always remains.'

E-mail : rajdip5678@gmail.com • M. : 9836569850

রাতের আকাশে আঁধার কেন?

অনিন্দ্য দে

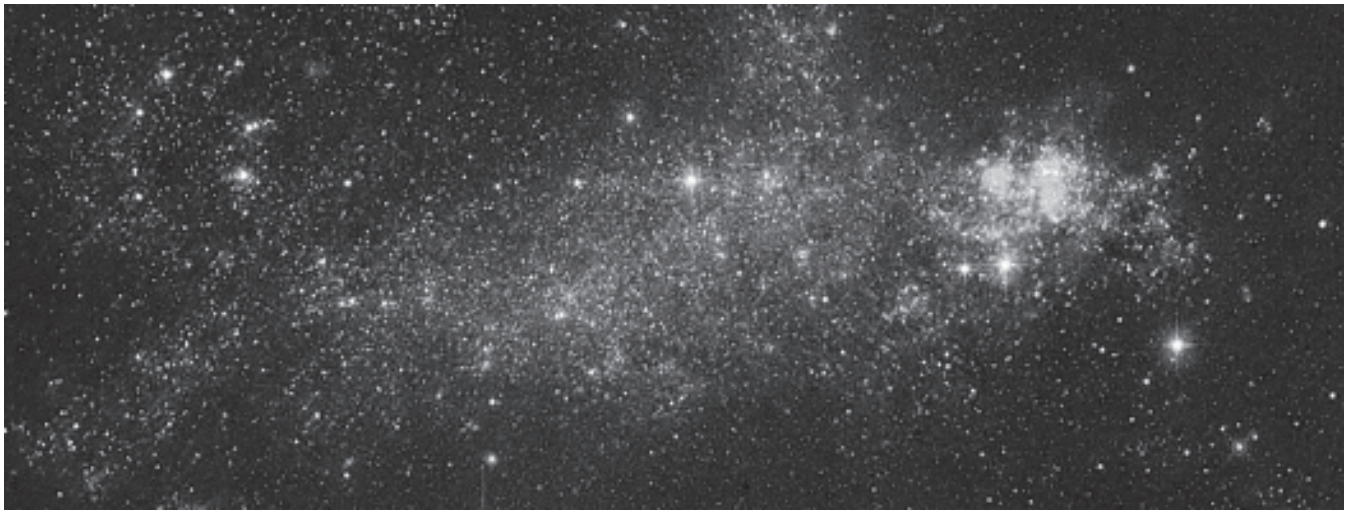

মেঘমুক্ত রাতের আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে লক্ষ-কোটি তারা। এরা সবাই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। অথচ রাতের আকাশটা কিন্তু নিকষ কালো। ১৬১০ সালে যোহান কেপলার এই রহস্যের সমাধানে বেশ অনেকটা এগিয়েছিলেন। ১৮ শতকে এডমন্ড হ্যালিও বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮২৩ সালে এই ধাঁধার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাইনরিখ ওলবার্স্।

আসলে জ্ঞানচর্চার একেবারে শুরু থেকেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের এই মহাবিশ্ব সীমাহীন, এর জীবন অনন্ত। তার মানে, সময় এগোলেও বার্ধক্য তাকে ছুঁতে পারেনি। কিন্তু এরকম একটা মডেল ধরে এগোতে গেলেই আমরা দেখব, প্রতি সেকেন্ডে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে তাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যাবে না; সীমাহীন উষ্ণতায় দগ্ধ হবে তার সারা অঙ্গ। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর আকাশ অসীম ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা। অথচ রাতের আকাশে এক অদ্ভুত আঁধার। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই ধাঁধার পোষাকি নাম 'ওলবার্স প্যারাডক্স'।

১৮৪৮ সালে 'ইউরেকা—একটি গদ্য কবিতা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো। সেই প্রবন্ধের আইডিয়া অবলম্বন করে লর্ড কেলভিন ১৯০১ সালে একটা গবেষণা পত্রে লিখলেন, মহাবিশ্বে নক্ষত্রের সংখ্যা যদি অসীম হয়, তাহলে আকাশের প্রত্যেকটা বিন্দুতেই কোনো না-কোনো একটা নক্ষত্রকে পাওয়া যাবে। তাহলে আকাশে বেশির ভাগ অঞ্চলটাই অন্ধকার কেন? কেলভিন বললেন— ওই অন্ধকার অঞ্চলে যে নক্ষত্রগুলো আছে তারা পৃথিবী থেকে এতটাই দূরে যে তাদের আলো এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি। আবার ঘন মেঘের দেওয়াল ভেদ করে অতিদূর নক্ষত্রলোকের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে না— সেরকম একটা ধারণাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা ধোপে টেঁকে নি। কারণ সেরকম হলে নক্ষত্রের বিকিরণে ওই মেঘের চাদর নিজেই গরম হতে শুরু করত, আর তাতে নক্ষত্র থেকে ঠিক যতখানি আলো বেরোয়, মেঘের আস্তরণ থেকে ঠিক ততখানি আলোই বেরিয়ে আসত। সুতরাং, রাতের আকাশ আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠারই কথা ছিল।

এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতেই ১৯১৬ সালে আমরা পেয়ে গেলাম আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে দেখানো গেল যে, আমাদের এই মহাবিশ্বের বিস্তার মোটেও সীমাহীন নয়; তবে সময়ের সাথে তার সীমানাটা বেড়ে চলেছে। মহাবিশ্ব যে চিরস্থায়ী নয় জেনারেল রিলেটিভিটির তত্ত্ব সেটাও বলে দিল। সুদূর অতীতে তুমুল বিস্ফোরন, 'বিগ ব্যাং' থেকে এর যাত্রা শুরু। তার মানে, এই মহাবিশ্বের সবথেকে পুরনো নক্ষত্রটা যেখানে আছে তার থেকেও দূরের কোন অঞ্চল থেকে পৃথিবীতে আলো আসার কোন প্রশ্নই নেই। আবার মহাবিশ্ব যেহেতু ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাই দুটো নক্ষত্রের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেশির ভাগ দৃষ্টিরেখাই কোন নক্ষত্রে গিয়ে পৌঁছবে না। হিসেব কষে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের এই প্রসারণের ব্যাপারটা যদি না থাকত, আর তার বয়সটা যদি আরও একটু কম হত, তাহলে রাতের আকাশের ঔজ্জ্বল্য প্রায় ৫০০০ কোটি গুণ বেড়ে যেত। সুতরাং, ক্রমশ প্রসারণশীল মহাবিশ্বে ঘন অন্ধকারে ভরা রাতের আকাশ দেখা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।

আলোচনাটাকে এখানেই শেষ করে দেওয়া যেত, কিন্তু তার উপায় নেই। কারণ জেনারেল রিলেটিভিটির বিশ্লেষণ যে আমাদেরকে আরো গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেটাও একটু বুঝে নেওয়া দরকার। বিগ ব্যাং-এর পরে, প্রায় ৩ লক্ষ বছর পর্যন্ত মহাবিশ্বের উষ্ণতা এতটাই বেশি ছিল যে ফোটন, ইলেকট্রন আর প্রোটন একসাথে ভেসে বেড়াতে পারত। সেই ভাসমান ইলেকট্রনের ধাক্কায় ফোটন খুব বেশিদূর এগোতে পারত না। ফলে আকাশ ভরে থাকত উজ্জ্বল আলোয়। অর্থাৎ প্রাগৈতিকহাসিক যুগের আকাশ আজকের তুলনায় যে অনেকটা বেশি ঝলমলে ছিল সেটা পরিষ্কার। কিন্তু প্রসারণের সাথে সাথে উষ্ণতা কমতে কমতে যখন ৩ হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি এল, তখন থেকে শুরু হল ইলেকট্রন আর প্রোটন একজোট হয়ে হাইড্রোজেন পরমানু তৈরি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা এখন অনেক কম। তাই ফোটন এখন সহজেই অনেকটা দূরে চলে যেতে পারে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মহাবিশ্বের সীমানা। ফলে কমছে ফোটনের শক্তি, কমছে আলো। সুতরাং, মহাবিশ্বের প্রসারণ যতদিন চলবে, রাতের আকাশ আরো গভীর থেকে গভীরতর আঁধারে ডুবতে থাকবেই।

E-mail : anindya05@gmail.com • M. : 9432220412

শিক্ষকের শিক্ষক তারকমোহন

দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে সত্যি সত্যিই ইন্দ্রপতন হল। প্রফেসর ডঃ তারকমোহন দাস আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা হারালাম এক একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধককে।

সঙ্গীতজ্ঞ পরিবার থেকে আসা তারকমোহনের ছোটবেলা থেকেই ছিল বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে খিদিরপুর একাডেমীতে ক্লাস ফোরে ভর্তি হন। জীবনে কোনদিন তিনি দ্বিতীয় হননি। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ এবং লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে শিক্ষা লাভ করেন।

স্কুল জীবন থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে একটি পত্রিকা বার করেন। যার নাম ছিল বিজ্ঞান জগৎ। যুগান্তর সাময়িকীতে রেডিয়ামের উপর একটি বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখেন। তখন তিনি ক্লাস সিক্সের ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কী করে সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য করে বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রকে সকলের সামনে তুলে ধরা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা না বাড়ালে, সমাজের বুক থেকে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হবে না। তিনি বুঝেছিলেন অধিকাংশ মানুষই কোন কিছু ভাল করে দেখে না। দেখার মতো করে দেখতে জানে না। তার ফলে তার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি হয় বেঠিক, না হয় অসম্পূর্ণ। তাই কিভাবে সঠিক পর্যবেক্ষণ করতে হয়, জীবন বিজ্ঞানের প্রথম সিলেবাসে তা খুব যত্নের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার-এর স্নাতকোত্তর বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। স্বল্পভাষী তারকমোহন এর আগে বোটানী ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক প্রফেসর S. M. Sircar-এর অধীনে উদ্ভিদের হরমোনের (Plant Hormones) উপর গবেষণা করেন। ১৯৫৩ সালে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক F. G. Gregory-এর অধীনে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তার গবেষণার বস্তু ছিল : Plant hormones in Vernalized embryo and extension growth of rye crop under Photoperiodic treatment. এছাড়াও তিনি আমেরিকার পাড়ডু ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর A. C. Leopold-এর অধীনে Physiology of Senescence (১৯৬২-৬৩) উপর গবেষণা করেন এবং পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনে (University of Wisconsin) প্রফেসর A. C. Hildebrandt-এর অধীনে Isolated single Cells of Tobacco with Photomicrographic technique-এর উপর গবেষণা করেন।

তিনি শুধুমাত্র পাঁচ দশক ধরেই শিক্ষকতা করেননি। তিনি অসংখ্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করে গেছেন। তিনি যুগ্ম ও এককভাবে সব মিলিয়ে প্রায় ১১০টি মৌলিক গবেষণা পত্র তৈরি করেছেন, যা সারা বিশ্বে ভীষণভাবে সমাদৃত। গবেষণা পত্রগুলির মধ্যে S. M. Sircar-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে Growth hormones of rice grains germinated at different temperatures, A. C. Hildebrandt ও A. J. Riker-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে Cine photomicrographic study of cell division on living tobaco cell এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর P. Pattanayak, A. Bhowmik এবং A. Ghosh-এর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে Dust filtering property of avenue trees and the effect of air borne particulate matters on growth and yield of paddy plants এবং এককভাবে Plants and Pollution, Pollution and Evolution, Philosophy in Science এবং Value of a tree বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালে তিনি প্রথম টাকার মূল্যে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে একটা পঞ্চাশ টনের বৃক্ষ পঞ্চাশ বছরে অদৃশ্যভাবে যে সমস্ত সম্পদের সাহায্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, সমস্ত জীবজগতকে রক্ষা করে পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে তার নগদমূল্য পনেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা।

তার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য', 'মানুষ একটি বিপন্ন প্রজাতি' এবং 'আমার ঘরের আশেপাশে' এইগুলি পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এর মধ্যে, 'পৃথিবী কী শুধু মানুষের জন্য' বইটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। আমার ঘরের আশেপাশে বইটি ১৯৬৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গ্রন্থ হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কার এবং মানুষ একটি বিপন্ন প্রজাতি বইটি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার অর্জন করে।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে সর্বভারতীয় বিজ্ঞান পত্রিকা Indian Biologist-এর সম্পাদনা করেছেন।

১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Department of Science and Technology (DST) এবং The Ministry of Environment and Forest, DCPL প্রভৃতি অনেক বিভাগে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।

তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ Botanical Society of Bengal তাঁকে দেন Professor S. M. Sircar Medal, এবং পরিবেশ ও জীববিজ্ঞানের কাজে তার বিশেষ অবদানের জন্য তিনি S. C. Roy Medal এবং Gopal Ch. Bhattacharya Memorial পুরস্কারে ভূষিত হন।

তিনি বার বার বলতেন, হাজারটা কথায় যা বোঝান যায় না, তা একটা ছবির মাধ্যমে সহজেই বোঝান যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি সত্য। তাই তিনি অনেক শিক্ষামূলক DVD প্রকাশ করে গেছেন। তার মধ্যে The World Under The Microscope, Inside the Living Cell, The DNA Molecule বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষ জীবনে তিনি Green Economy for Daily Use নামে একটি বই লেখেন। সেই বইয়ে তিনি Solar Cooker-এর ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখে গেছেন।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি জীবনের স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন ও আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু একটা যুগের অবসান যে ঘটল তাই নয়, আমরা হারালাম একজন শিক্ষকের শিক্ষককে।

E-mail : dwijen44152@gamail.com • M. : 9433344152

খাদ্যে ভেজাল ধরবেন কিভাবে : রঙিন মিষ্টি

জয়দেব দে

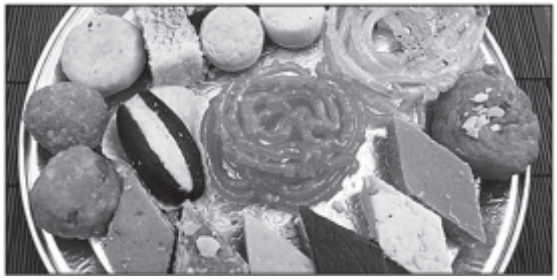
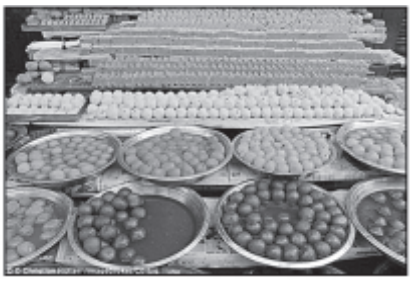

খাবারে রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছিল মিশরীয় সভ্যতার যুগে। তখন অবশ্য প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হত। ১৮৫৬ সালে প্রথম কৃত্রিম রঙ (মৌভাইন) প্রস্তুত হয়। ক্রেতাদের মন জয় করার জন্য সারা পৃথিবীতে ব্যাপক হারে এর ব্যবহার শুরু হয়। মিষ্টির দোকানে লাল টকটকে দই, রঙিন মিষ্টি আরো কত কি। যেমন মিহিদানা, বোঁদে, লাড্ডু, ফ্রায়েড রাইস, চকোলেট, লজেন্স, সিরাপ, জিলিপি, জ্যাম, জেলি, সস্ ইত্যাদি। হলুদ রঙের জন্য মেটানিল ইয়েলো বা কেশরি রঙ এবং লাল রঙের জন্য কঙ্গো রেড বা রোডামিন-বি মেশানো হয়।

বাড়িতে কিভাবে এই পরীক্ষা করবেন?

❖ **পরীক্ষা-১ :**

কটকটে হলুদ মানেই যে মেটানিল ইয়েলো বা কেশরি রঙ আছে সেটা বুঝবেন কিভাবে? বাড়িতে বসে সহজেই এটা করা যেতে পারে। নমুনা খাবারের টুকরোটি নিয়ে একটি পাত্রে রেখে সামান্য দ্রবণ তৈরি করে তাতে কয়েক ফোঁটা মিউরেটিক অ্যাসিড (লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl) মেশাতে হবে। এর পর মিশ্রণটি গোলাপি বর্ণ হলে বুঝতে হবে খাবারটিতে কেশরি রঙ বা মেটানিল ইয়েলো মেশানো আছে।

কেশরি রঙ আসলে এক ধরনের অ্যাসিড অ্যাজো ডাই যৌগ (রঞ্জক দ্রব্য)। এটা আসলে শিল্পের জন্য বিশেষত বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়। খাবারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মেটানিলিক অ্যাসিড তৈরি হয়। মেটানিল ইয়েলোর রাসায়নিক সংকেত $C_{18}H_{14}N_3NaO_3S$।

❖ **পরীক্ষা-২ :**

তরল প্যারাফিনে তুলো ভিজিয়ে অথবা নারকেল তেল লাল রঙের খাবারের গায়ে ঘষতে থাকুন। খাবারটি রঙ লাল হলে বুঝতে হবে যে রঙটি আসলে কঙ্গো রেড।

কঙ্গো রেড এক ধরনের ডায়াজো ডাই (রঞ্জক দ্রব্য)। বস্ত্র শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক সংকেত $C_{32}H_{22}N_6Na_2O_6S_2$

রোডামিন-বি ধরতে অন্য একটি পরীক্ষা করে বুঝতে হবে। প্রথমে খাবারটির দ্রবণে সামান্য কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড CCl_4 যোগ করলে রঙ অদৃশ্য হবে। পরে আবার লঘু হাইড্রো ক্লোরিক অ্যাসিড HCl যোগ করলে লাল রঙ ফিরে আসবে।

রোডামিন লাল রঙের ধনাত্মক রঞ্জক। বস্ত্র শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়।

কী কী ক্ষতি হয়?

মেটানিল ইয়েলো বা কেশরি রঙের জন্য ক্ষতি : কিডনি ও ফুসফুসের রোগ, কর্কট রোগ, স্তনের টিউমার, শুক্রাণু উৎপাদনে ব্যাঘাত করে।

রোডামিন-বি বা কঙ্গো রেড-এর জন্য আমাদের শরীরে নানা ধরনের রোগ হয়, যেমন—মস্তিষ্ক, মুত্রাশয়ে ও চোখে ক্ষত করে, প্লীহা, ও যকৃতের ক্ষতি করে, শুক্রাশয় উৎপাদনে ব্যাঘাত করে, স্তনের ক্ষতি করে ও শরীরে টিউমার হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভালো বাসার জন্য

সম্রাট সরকার

ক্ষণিক দেখা। এই প্রখর গ্রীষ্মে। ঘন সবুজ পাতায় ছাদ ঢাকা আমবাগানের নীচে।

দুটি পাখি। জাতে thrush। বাংলায় 'দামা'। সঠিক ইংরাজিটা বেশ খটোমটো। Orange-headed ground thrush। প্রচুর চেষ্টা করে মাত্র তিনদিনের সাক্ষাৎ। প্রথম প্রথম বেশ দূরত্ব তৈরি করেছিল। ক্যামেরা নিয়ে যতই এগোই তত তারা আরো ছায়া-ঢাকা অন্ধকার ঝোপে সেঁধিয়ে যায়। Salim Ali লিখে গেছেন Usually shy। শেষ-মেশ আমাকে বন্ধু বলে মেনেছে। কয়েক দিনের বন্ধু। তারপর আর দেখিনি।

পর্যবেক্ষণের প্রথম দিন : সাকুল্যে একঘণ্টার পর্যবেক্ষণ। তারই মধ্যে পুরুষ পাখি স্ত্রী পাখিকে তিন থেকে চার বার ঠোঁট ভর্তি কেঁচো খাওয়ালো। স্ত্রী-পাখিটিকে বেশি নড়াচড়া করতে দেখিনি। শুধু নিজের পালক ঠোঁট দিয়ে পরিস্কার করে যাচ্ছে। আর পুরুষ পাখিটি শুকনো পাতা সরিয়ে কেঁচো খুঁজে নিয়ে এসে মহানন্দে স্ত্রী-টির মুখে দিয়ে দিচ্ছে। খাওয়ার

পর স্ত্রী-টি রৌদ্র-ছায়া মাখা শুকনো পাতার মেঝেতে যেখানে সূর্যের আলো এসে পড়েছে সেখানে ডানা দুপাশে ছড়িয়ে বসে পড়ছে। সেলিম আলি তার বই Birds of Indian Sub-continent-এ লিখেছেন শুধু পুরুষ-পাখিটির পূর্বরাগ (Courtship) প্রদর্শন ও গান গাওয়ার কথা। এহেন খাইয়ে দেওয়ার কথা তিনি লেখেননি। স্ত্রী-টি ঠোঁট ফাঁক করে পুরুষটির কাছে খাবার প্রার্থনাও করতে দেখলাম।

দ্বিতীয় দিন : সেই একই দৃশ্য। পুরুষটি সমানে খাইয়ে চলেছে স্ত্রী-টিকে। তবে ডানা ছড়িয়ে বসে থাকার কাজটি আর করছিল না।

তৃতীয় দিন : একটা অদ্ভুত স্বভাব লক্ষ্য করলাম। পুরুষটি আগের মতোই স্ত্রী-টিকে খাইয়ে চলেছে। হঠাৎ স্ত্রী-টি ঠোঁটে করে একটা শুকনো ঘাস তুলল। পুরুষটি কাছেই ছিল। সে খুব দ্রুত পালটা কিছু ঠোঁটে করে খড়-কুটো জোগাড় করে স্ত্রী-টির কাছে এলো। তারপর গাছের ডালে বসে পরস্পরের ঠোঁট থেকে সেই খড়-কুটো বিনিময় করে নিলো।

সিদ্ধান্ত : ১. পৃথিবীর বহু পুরুষ পাখি তাদের প্রজনন মরসুমে সঙ্গিনী নির্বাচনের সময় থেকে ডিমে তা দেওয়ার সময় পর্যন্ত সঙ্গিনীকে খাইয়ে যায়। আমেরিকান রবিনের ক্ষেত্রে আবার উল্টোটাও ঘটে। স্ত্রী পুরুষটিকে খাওয়ায়।

২. স্ত্রী-পাখিটির ওইরকম ডানা ছড়িয়ে বসে পড়ার ঘটনাটি সম্ভবত স্ত্রী-পাখিটির সম্মতি জানানোর লক্ষণ। যদিও এই বিষয়ে কোনো গবেষণা বা পর্যবেক্ষণ আমি পাইনি।

৩. বেশ কিছু কারণে পুরুষটি স্ত্রী-টিকে প্রজননের সময় খাওয়ায়। প্রথমত, এই কাজটি তাদের দাম্পত্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। দ্বিতীয়ত প্রজননের সময় স্ত্রী-কে প্রচুর শক্তি খরচ করতে হয় শরীরে ডিম তৈরি, ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়ার জন্য তাপমাত্রা তৈরি ইত্যাদি কাজে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খাদ্যের যোগান ঠিক-ঠাক থাকলে ডিমের সংখ্যা এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা বের হতে কম সময় লাগবে।

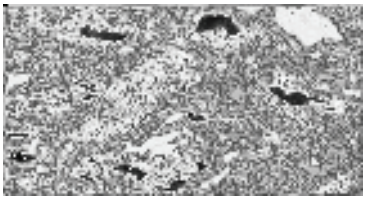

৪. তৃতীয় দিনের সেই অদ্ভুত আচরণের কারণ অনুমানের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, হয়তো স্ত্রী-পাখিটি ঠোঁটে করে একটা শুকনো ঘাস তুলে পুরুষ-টিকে বলতে চাইল এবার বাসা বাঁধার সময় এসে গেছে। শুকনো ঘাস তাদের বাসা বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।

শেষে বলি, ওদের সহবাস বা Mating আমি ওই তিন দিনে দেখিনি। আমি যেখানে ওদের এই সুমধুর দাম্পত্যের সাক্ষাত পেয়েছিলাম সেখানে ওরা বাসাও বাঁধেনি। তবে মুখে করে বাসা তৈরির জন্য শুকনো ঘাস অন্যত্র নিয়ে যেতে দেখেছি পুরুষ-টিকে। জানিনা ওদের সে দাম্পত্য সফল হয়েছে কিনা। কিন্তু তাদের ভালোবাসা গভীরভাবে ছাপ ফেলে গেছে মনে।

E-mail:samratwagata11@gmail.com • M. : 9433962227

রহস্যভেদ

ড. শৈবাল ঘোষ

মানসিক আঁক

$১১^৩$ = ১৩৩১, $১২^৩$ = ১৭২৮, হলে ১৪৪২৮৯৭-এর ঘনমূল খাতা-কলম ব্যবহার না করে বল।

(উত্তর ৯ পাতায় দেখুন।)

একটি আষাঢ়ে গোয়েন্দা গল্প এবং ফেলু মিত্তির

ফেলুদা আর তোপসে দার্জিলিং যাবে বলে দার্জিলিং মেলে উঠল। তাদের সাথে আরও তিনজন সহযাত্রী ছিলেন যাদের নাম— অতনু, আকাশ আর অমিতাভ। তোপসে হঠাৎ ফেলুদাকে বলল, 'ফেলুদা, night lamp-টা জ্বলছে না।' ফেলুদা বলল, 'যা গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে নিয়ে আয়।' তোপসে গেল আর খনিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল, 'ফেলুদা, গিয়ে দেখি তিনজন লোক বসে আছে। ওঁনাদের বলতে ওঁনারা বললেন, আমরা হলাম গার্ড, ড্রাইভার ও ইঞ্জিনিয়ার, আর আমাদের নামগুলো তোমাদের সহযাত্রীদের নামে। তোমার কাকা তো গোয়েন্দা! ওঁনাকেই বলতে বল আমাদের মধ্যে কে ইঞ্জিনিয়ার?' ফেলুদা বলল, 'আর কিছু জানতে পেরেছিস?' তোপসে যা বলল সেগুলো হল—

১. সহযাত্রীরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকেন। ২. Mr. অমিতাভ সোদপুরে থাকেন। ৩. গার্ড হালিশহরে থাকেন। ৪. Mr. অতনু একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ। ৫. যে যাত্রীর নাম গার্ডের নামের সাথে এক, তিনি ভাটপাড়ার বাসিন্দা। ৬. গার্ড আর একজন যাত্রী (যিনি কিনা বিদ্যালয় স্তরের অঙ্কই করতে পারেন না) একসাথে প্রাতঃভ্রমণ করেন। ৭. আকাশ ড্রাইভারকে সবসময় দাবাখেলায় হারিয়ে দেন। এতদূর শুনে ফেলুদা বলল— 'Elementary তোপসে।'

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

তোমরা বলবে— ইঞ্জিনিয়ার কে?

[রহস্য ভেদ করে পত্রিকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। রহস্যভেদ পরের সংখ্যায়।]

E-mail : cool.soibal@rediffmail.com • M. : 9432648313

ডাইনি সমস্যা কি আদৌ মেটবার?

বিবর্তন ভট্টাচার্য

আমরা সাঁওতালপল্লির কাছে থাকায় ডাইনি সমস্যা সম্পর্কে ছোটোবেলা থেকেই ওয়াকিবহাল। ফুলমণিকে যখন চুল কেটে হাঁসুয়ার কোপ দিয়ে মেরে ফেলা হয় তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। ওর চুল কেটে নেওয়ার পর যেভাবে ওকে কুপিয়ে মারা হয়েছিল তা দেখে শিশু মনে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। কিন্তু কেন এমন হয় সেই বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক চেতনা আমার ছিল না। এরপর বহু বছর চলে গেছে। শিকার উৎসব হলে ওদের পাড়ায় আমার নিমন্ত্রণ থাকলেও প্রতিবছর যাওয়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু ফুলমণিকে ভুলতে পারি না। সরস্বতী পুজোর রাত ৯-৩০, কল্যান আমাকে এসে খবর দিল, শম্ভু মান্ডি ওদের কারখানার একজন শ্রমিক, ওকে খবর দিয়েছে, ওদের তিনবোনকে ডাইন সাব্যস্ত করেছে হুগলি জেলার জানগুরু। কারণ পাশের বাড়ির পানমণি কিস্কু (বয়স-১২) দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে শম্ভু মাণ্ডির বোনদের নজরের কারণে। তাই এই তিনবোনকে খতম করে ওদের রক্ত পানমনির কপালে লাগিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কল্যান আমাকে অনুরোধ করে— যেহেতু ওই পাড়াতে তোমার যাতায়াত আছে, একবার কথা বলতে আপত্তি কী?

আমার যে খুব ইচ্ছা ছিল তা নয়। কিন্তু ফুলমণির মৃত্যু তখনও আমাকে তাড়িত করছে। সকালবেলা উপস্থিত হলাম মঙ্গল কিস্কুর বাড়ি। মঙ্গলের বউ রাই কিস্কু পান্তাভাত গামছায় বেঁধে মাঠে কাজে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। এই সময়ে ওর বড়ো মেয়ে লক্ষ্মী কিস্কু (মাধ্যমিক দেবে) বেরিয়ে এসে একটা মাদুর পেতে দিল দাওয়াতে। ও আমাকে চেনে। ওর মাকে হাসপাতালের কথা বলতেই ওর মা বলল ওসব কিছু হবে না। হাসপাতাল গরিব মানুষের নয়। ওখানে গেলে ফেলে রেখে মেরে ফেলবে আমার মেয়েকে। আসলে হাসপাতাল থেকে জানগুরুর আদেশ অনেক বড়ো। আমি চাকদহ হাসপাতালের ভালো ডাক্তারবাবুর নাম করি যিনি শিশু বিশেষজ্ঞ। ওর মা বলে, যা লাইন, আমার রোজ নষ্ট করে যাওয়ার সময় নেই। আমি নাছোড়। বলি যদি বিকেলে হয়। লক্ষ্মীর সাথে কথা বলে সম্মতি পাই। বিকেলে ভ্যানে করে বিছানায় শুইয়ে পানমণিকে হাসপাতালে আনা হয়। ডঃ অধিকারী দেখে বললেন এই হাসপাতালে কিছু করা সম্ভব নয়। ওর কিডনির অবস্থা খারাপ আর সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন। ওকে আর. জি. কর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে কল্যানকে সব জানাই। ওই রাতে ও বলে, থানায় একটা ডাইরি করা উচিত। যদি পানমণি মরে যায় তবে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। আমি রাজি হচ্ছিলাম না থানায় যেতে। কিন্তু কল্যানের চাপে বাধ্য হলাম। কিন্তু কোনো ডাইরি করব না এই শর্তে। আই. সি. ঘটনা শুনে প্রথমেই আমাকে রেগে গিয়ে বললেন, বেশি হিরো হতে যাবেন না। তীরের ফলা পেটে ঢুকলে তা অপারেশন করে বার করতে হবে।

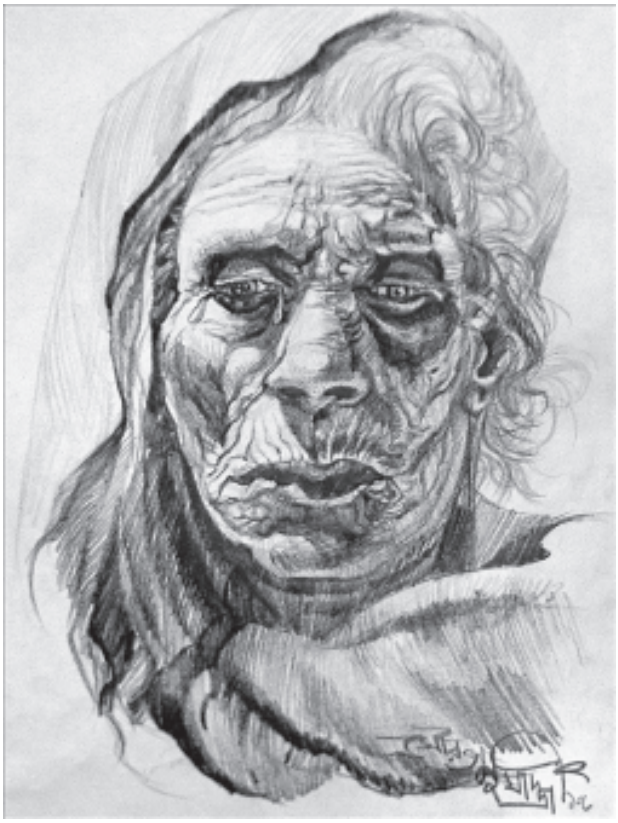

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

সকালবেলা ভোর পাঁচটার ট্রেনে আমি লক্ষ্মী, রাই, পানমণিকে নিয়ে রওনা হলাম আর. জি. কর হাসপাতালের উদ্দেশে। আউটডোরে লাইন দিয়ে যখন দুপুর ১টার সময় ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছালাম তখন আউটডোর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পানমণির মা রাই অত্যন্ত বিরক্ত- 'আমি বলেছিলাম কিছু হবে না। মাঠের কাজটাও আজ মার খেল।'

ডিপার্টমেন্টাল হেড (চাইল্ড ইউনিট) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কথা বলবার জন্য সামনে যেতে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন আমার মিটিং আছে, কথা শোনবার সময় নেই। আমি পা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি সহ তিনজন খুন হয়ে যাবে—বলে ড. অধিকারীর চিঠিটা ওনার হাতে দিলাম। উনি ওই চিঠি পড়ে চিঠির পিছনে লিখে দিয়ে বললেন, ডাক্তার কিস্কুর কাছে যান। ও ভর্তি নিয়ে নেবে। কিন্তু একজনকে থাকতে হবে। ডাক্তার কিস্কু ভর্তি নিয়ে নিলেন। শুরু হল যাত্রা। ওর মা রাই রোজ-এর কাজ বন্ধ করে হাসপাতালে থেকে গেল। শুরু হল অসম লড়াই। আমি আর লক্ষ্মী দুপুরে যাই আর রাতে ফিরি। সরকারি চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে ও আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে। আমরা প্রতীক্ষায় থাকি কবে ফিরবে পানমনি। পাড়াতে দূর হবে ডাইনির কালিমা। যেদিন পানমণি পাড়াতে ফিরল সেদিন যেন উৎসব। এতদিন মঙ্গল (লক্ষ্মীর বাবা) আমার সাথে কথা বলত না। লক্ষ্মীকে বলল, দাদাকে মিষ্টি খাওয়া। আমি বললাম, আজ বল ডাইনি বলে কিছু হয়?

ওই আদিবাসী পাড়াতে এখনও শিকার উৎসব হয়। তবে ডাইনি নেই। আর লক্ষ্মী এখন বিজ্ঞানকর্মী।

E-mail : bibartancbss@gmail.com • M. : 9332283356

উঠতি ত্রাস—'সোয়াইন ফ্লু' আদপে 'প্যানডেমিক ফ্লু'

ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

এতদিন ধারণা ছিল গরম বাড়ার সাথে সাথে ফ্লু-র প্রভাব কমে। মানুষ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় না। কিন্তু এবার তাপমাত্রার পারদ ৪০° ছুঁই ছুঁই করলেও 'সোয়াইন ফ্লু'-এ আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে মৃত্যুর খবরও আসছে। সত্যি কথা বলতে কি, তুলনায় আমাদের রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা কম। পশ্চিম ও দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে পরিস্থিতি যথেষ্টই ভয়াবহ। এই বছরের প্রথম কয়েক মাসেই সারাদেশে মৃত্যু ছড়িয়েছে ১০০-র বেশি; একা মহারাষ্ট্রেই সংখ্যাটা ৬৩। গুজরাট,

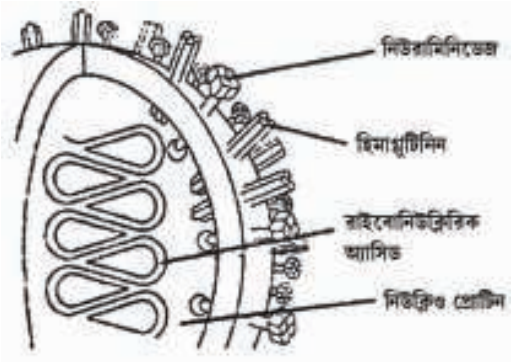

ফ্লু ভাইরাসের গঠন

তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রয়েছে ঠিক পরের সারিতে। সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের প্যানডেমিক বা আন্তর্জাতিক চরিত্র থাকায়, জনমনে এর ভীতি তৈরি হবার রসদ রয়েছে যথেষ্টই। তবে প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের নামকরণে রয়েছে বিস্তর ত্রুটি। অর্থাৎ এটি একটি 'মিস্‌নমার'। এই ভাইরাসটি আদপেই সোয়াইন অর্থাৎ শূকরের দেহে রোগ তৈরি করে না। এটি একটি মানুষের দেহে ফ্লু (সর্দিজ্বর) সৃষ্টিকারী H_1N_1 ভাইরাস। তাই এই জাতীয় রোগকে প্যানডেমিক ফ্লু আর তার ভাইরাসকে প্যানডেমিক H_1N_1 ফ্লু-ভাইরাস বলা উচিত।

প্যানডেমিক ফ্লু আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সাধারণ সর্দিজ্বর-এর উপসর্গ হাঁচি, কাশি, জ্বর হওয়া ছাড়াও গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, নাক বন্ধ থাকা, সারাগায়ে ব্যথা, মাথাঘোরা, বমি পাওয়া, পাতলা পায়খানা, এমনকি খিঁচুনী ও কনজাইটিভাইটিস-র মত লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও আশেপাশে থাকা মানুষদের সহজেই আক্রমণ করে। যেকোনও বয়সের মানুষই এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। তবে ১২ বছরের কম বয়সী শিশু, ৬০ বছরের বেশি বয়সী বৃদ্ধ ও অন্তঃস্বত্বা মহিলাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ব্লাড সুগার ও ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এই ধরনের ফ্লু ভীষণ বিপদ ডেকে আনতে পারে। অনেকগুলো অঙ্গ বিকল (মাল্টি অর্গান ফেলিওর) হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। তবে অযথা আতঙ্কিত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা জরুরি।

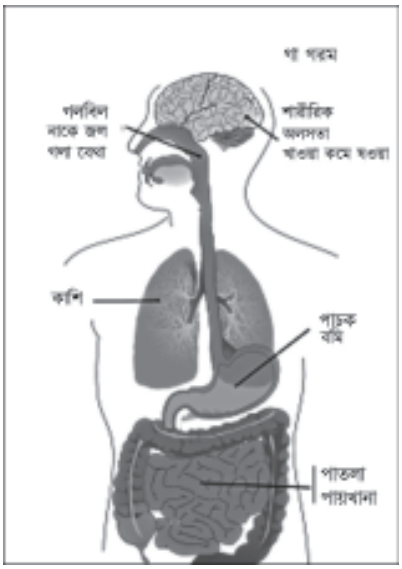

ফ্লু-এর লক্ষণ

সুখের কথা, এই রোগের ওষুধ রয়েছে। অসেল্টামিডির (ট্যামিফ্লু) ও জানাভির (রেলেঞ্জা) দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শমত যে কোনও ওষুধ খাওয়া উচিত। অসুখ হলেই ওষুধের দোকান থেকে নিজের পছন্দমতো গা ব্যথার ওষুধ অথবা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়া একদম ঠিক নয়। যেটা করতে হবে, তা হল কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। যেমন— বার বার সাবান জলে হাত ধোয়া;

হাত দুটো নাক, চোখ বা মুখে ঠেকাবার অভ্যাস থেকে বিরত থাকা। হাঁচি-কাশির সময় হাত দিয়ে নাক/মুখ ঢাকার অভ্যাস। সবার সাথে কয়েকদিন না মিশে নিজেকে একটু আলাদা রাখা। বিশেষ করে অফিসে বা স্কুলে না যাওয়া। সম্ভব হলে বিশেষ ধরনের মুখোশ (সার্জিক্যাল মাস্ক)-N95 ব্যবহার করা।

এই প্যানডেমিক ফ্লু-র টীকাও তৈরি হয়েছে। তবে এখনও সেগুলো বাজারে সেভাবে আসেনি। এই মুহূর্তে এই রোগের প্রশ্নে সরকারী 'টীকা-নীতি' স্পষ্ট নয়। আশা করা যায়, খুব শিগগির-ই প্যানডেমিক ফ্লু-র টীকা চালু হবে এবং বর্তমানের ভয়াবহতা কিছুটা হলেও কমবে।

লেখকের পরিচিতি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, E-mail : joardar69@gmail.com • M. : 9231533335

মানসিক আঁকের উত্তর

১১০^{৩}, ১২০^{৩} ও ১৪৪২৮৯৭ তিনটিই সাত অঙ্কের সংখ্যা এবং ১১০^{৩} < ১৪৪২৮৯৭ < ১২০^{৩}। ১৪৪২৮৯৭-এর এককের অঙ্ক ৭, কাজেই ১৪৪২৮৯৭-এর ঘনমূল = ১১৩।]

ক্যান্সার থেকে বাঁচতে কি খাব না, কি খাব

ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ

খাদ্যের সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্সারের যোগাযোগ বেশ প্রগাঢ়। বেশ কিছু খাদ্য যেমন ক্যান্সার উৎপাদনে সাহায্য করে, তেমনই এমন অনেক খাদ্যই রয়েছে যা, ক্যান্সার প্রতিরোধক।

আজ আমরা টাটকা সজীব শাকসবজী, টাটকা মাছ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল পাই না বললেই চলে। শস্যদানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে মারাত্মক সব রাসায়নিক সার, যার মধ্যে প্রায় সবগুলিই ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থ, বহু খাদ্যবস্তুই নানান পরিবেশদূষণকারী পদার্থ দ্বারা দূষিত থাকে, সেগুলি খাওয়ার আগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধোওয়া হয় না। পানীয় জলও নানা ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থের (Carcinogen) উপস্থিতিতে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সর্বোপরি রয়েছে গরিব দেশে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভাব। ফলস্বরূপ সঠিক মাত্রায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ লবণ এবং ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। যার ফলে, প্রতিনিয়ত ভোজ্য হিসাবে গ্রহণ করা নানান কারসিনোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কারসিনোজেন (Carcinogen) বা ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ কী?

কারসিনোজেন নানা ধরনের যৌগ বা পদার্থ, যা আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সুস্থ কোষকলাকে ক্যান্সার কোষকলায় পরিণত করতে সাহায্য করে। এমন শয়ে শয়ে কারসিনোজেনকে প্রতিহত করা কিংবা এর থেকে দূরে থাকা অথবা এগুলির সৃষ্টিতে বাধা দেওয়ার কাজটা আমরা যথাযথভাবে করতে পারলে ক্যান্সারকে যে প্রতিরোধ করতে পারব, তাতে সন্দেহ নেই।

খাদ্যের মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের দুভাবে ভাবতে হবে : (১) খাদ্য যখন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় এবং (২) খাদ্য যখন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

১. খাদ্য যখন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

চর্বিজাতীয় খাদ্য : আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামের বান্টু উপজাতিদের মধ্যে, শিল্পাঞ্চলের মানুষদের চেয়ে ক্যান্সারের প্রকোপ কম। আসলে দেখা গেছে, এই বান্টু উপজাতি সমাজে অতি অল্প Fat বা চর্বিযুক্ত খাদ্য এবং প্রচুর Fibre বা আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবার রীতি রয়েছে। জাপান এবং ফিনল্যান্ডকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে, যে দেশ যত বেশি শিল্পে উন্নত, সে-দেশে খাদ্য থেকে ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেশি। এই ক্যান্সারগুলি সাধারণত Colon বা বৃহদন্ত্র, Rectum বা মলাশয়, Breast বা স্তন, Uterus বা জরায়ু এবং Prostate বা প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার। শিল্পোন্নত দেশগুলির মানুষ বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে থাকে, যা শিল্পে অনুন্নত দেশের মানুষেরা করে না।

নুন এবং নুনে সংরক্ষিত খাদ্য : নুন বা লবণকে অনেকে মনে করেন ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। লবণ দ্বারা সংরক্ষিত খাদ্য দিনের পর দিন খেলে পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীতে ক্যান্সার সৃষ্টি হচ্ছে।

ফাস্ট ফুড (Fast Food) : ফাস্ট ফুডে সাধারণত চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি থাকে, পরিমাণে সোডিয়াম লবণও বেশি থাকে, কিন্তু

আঁশযুক্ত খাবার থাকে পরিমাণে অতি অল্প, এমনকী অল্প থাকে ক্যালসিয়াম লবণও। তাই শুধু ক্যান্সার নয়, ঝুঁকি বাড়ে হৃদরোগের, ঝুঁকি বাড়ে হাড়ক্ষয়জনিত রোগেরও।

রেড মিট : পাঁঠা, খাসি, গরু, শূকর ইত্যাদির মাংসকে সাধারণভাবে রেড মিট বলা হয়। নিয়মিত রেড মিট গ্রহণে বৃহদন্ত্র এবং মলাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যে সংরক্ষক বা সংযোজক মিশ্রণ : নাইট্রেট দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা অনেক দিনের। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়। এই যৌগটি মাংসের সঙ্গে মেশালে মাংসকে বহুক্ষণ টাটকা রাখা যায়— রন্ধন করা মাংসও অনেক বেশি সজীব লাগে। অন্যান্য অনেক খাদ্যবস্তুই নাইট্রেট দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। নাইট্রেট যৌগটি নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং সেটা চূড়ান্তভাবে পাকস্থলীতে নাইট্রোসামাইন যৌগে পরিবর্তিত হয়, যেটি একটি কারসিনোজেন বা ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ। এর থেকেই পাকস্থলীতে ক্যান্সার হচ্ছে।

ছাতা (Fungus) পড়া খাদ্য : অনেক সময় বাদাম জাতীয় খাদ্যদ্রব্যগুলির উপর ছাতা পড়ে যায়, এর নাম অ্যাসপারগিলাস

ফ্লেভাস (Aspergillus flavus)। এই ছাতার মধ্যে থাকে আফলাটক্সিন (Aflatoxin) নামে একটি শক্তিশালী কারসিনোজেন, যা লিভার

ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

কীটনাশক পদার্থ থেকে : বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ, যেমন DDT, Aldrin, CCl_4, Arsenic, Vinyl Chloride ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারে খাদ্যবস্তু দূষিত হচ্ছে, আর যার ফলস্বরূপ ক্যান্সার রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে গেছে।

খাদ্যে সংযোজকের (Additive) মিশ্রণ : সংযোজক হিসেবে খাদ্যে মিশ্রিত বস্তুর কিছু কিছু সাংঘাতিক কারসিনোজেন বলে মনে করা হচ্ছে। খাদ্যবস্তুকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য বেশ কিছু সংযোজক মেশানো হয়, যার অধিকাংশই ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এগুলি হল, বিভিন্ন রঙ, যেমন মেটানিল ইয়েলো (বোঁদে, বিরিয়ানী, জিলিপি, কমলাভোগ বা ঘুগনিতে কখনো কখনো মেশানো হয়), আয়রণ অক্সাইড, লেড ব্রোমেট ইত্যাদি। এসব থেকে পাকস্থলী বা বৃহদন্ত্রের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে। এখন আবার বাজার ছেয়ে গেছে চাওমিন নামে এক ধরনের খাবারে। অতি আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু করার জন্য এর মধ্যে প্রায়ই মেশানো হচ্ছে জনপ্রিয় একটি পদার্থ। এর নাম আজিনো মটো (মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট)। জেনে রাখুন, এই পদার্থটি একটি সক্রিয় কারসিনোজেন।

আগুনে ঝলসানো খাদ্য (Smoked Food) : অনেক সময় আমরা মাছ, মাংস বা অন্যান্য সবজীযুক্ত খাবারকে আগুনে ঝলসে নিয়ে অর্থাৎ খাদ্যবস্তুকে ঝলসে বাদামী রঙে বা প্রায় পুড়িয়ে নিয়ে খেতে পছন্দ করি। এই ক্ষেত্রে কারসিনোজেন হল পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, যা, ওই খাদ্যবস্তুর উপরিতলে জমা হয়।

পানীয় : অত্যধিক মদ্যপান যে, মুখগহ্বরের, কণ্ঠনালীর, খাদ্যনালীর, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি কিংবা লিভার ইত্যাদির ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, তা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মহিলাদের মধ্যে যারা খুব বেশি মদ্য পান করে থাকেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কফি খুবই জনপ্রিয় পানীয়। কিন্তু এই পানীয় থেকে মূত্রথলির ক্যান্সার হতে পারে বলে গবেষকগণ মনে করছেন।

জল : জলে কখনো কখনো কিছু কিছু কারসিনোজেনের উপস্থিতি বেশ কিছু ক্যান্সার সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করে। দেখা গেছে, জলে মিশ্রিত ট্রাইহ্যালোমিথেন, পরিপাকতন্ত্র এবং মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। আবার, জলে যখন আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, অ্যাসবেসটস ইত্যাদি দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে (যেগুলি সবই পরিচিত কারসিনোজেন), তখন সেই জল থেকে ক্যান্সারের প্রবণতা যে বাড়ে, তাতে সন্দেহ নেই। খুব গরম পানীয় খাওয়ার অভ্যেস থেকে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের ঝুঁকির কথাও বলা হচ্ছে বেশি কিছু গবেষণায়।

২. খাদ্য যখন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে

ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই সহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থযুক্ত, বিশেষ করে সেলোনিয়ামযুক্ত ফলমূল, শাকসবজী ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ক্যান্সার প্রতিরোধ করছে বিভিন্নভাবে।

ক্যান্সার প্রতিরোধী কিছু খাদ্যবস্তু : লেবু জাতীয় ফল, টমেটো সবুজ শাকসবজী, আলু, পেয়ারা, আমলকি (ভিটামিন-সি-এর ভাণ্ডার), টমেটো, দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজী, আম, অন্য শাকসবজী, লাল গাজর, নটে শাক, মূলো (সবই ভিটামিন-এ-তে সমৃদ্ধ); বেশ কিছু শাকপাতা, উদ্ভিজ্জ তেল, শস্যদানা, মায়ের দুধ, বাদাম (এসবে ভিটামিন-ই রয়েছে)।

টমেটোর মধ্যে উপস্থিত লাল রঞ্জক পদার্থ লাইকোপিন (Lycopene), সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে পরিণত হতে বাধা দেয়।

অন্যান্য সবজীর মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে ইনডোল-3 কারবিনল (Indole-3-Carbinol), যা স্তন ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে।

যারা প্রচুর মাছ খেয়ে থাকেন, বিশেষ করে মাছের তেল, তাদের মধ্যে মুখগহ্বর, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী, মলাশয়, স্তন, বৃহদন্ত্র, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেস্ট গ্রন্থির ক্যান্সার হবার প্রবণতা কমে যায়। মাছের মধ্যে পাওয়া যায় ওমেগা-3 ফ্যাটি

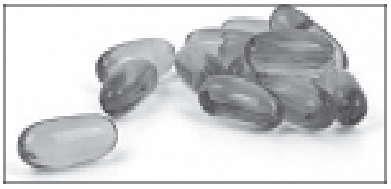

অ্যাসিড (Omega-3 fatty acids), যা এইসব ক্যান্সার থেকে মানুষকে রক্ষা করে। শিম-এর মধ্যে থাকে আইসোফ্লেভোন (Isoflavones), যা কিছু কিছু ক্যান্সার জিনকে ধ্বংস করতে পারে, যে-জিন সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে পরিবর্তনের বার্তা বহন করেন।

সোয়াবিনের মধ্যে থাকে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটার (Protease Inhibitors), যা ক্যান্সার সৃষ্টির শুরু দিকে সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে

পরিবর্তন হওয়া বন্ধ করে। সোয়াবিন থেকে বৃহদন্ত্র, স্তন, প্রস্টেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

শসার মধ্যে, বিশেষ করে শসার ছালে, পাওয়া যায় স্টেরলস্ (Sterols) যেটি গ্রহণ করলে শরীরের কোলেস্টেরল কমে, ফলে চর্বিও কমে এবং এই কারণে ঝুঁকি কমে বৃহদন্ত্র, মলাশয়, স্তন, প্রস্টেস্ট, জরায়ুর ক্যান্সারের। সুতরাং শসা খেতে হবে ছাল সমেত।

রসুন এবং পেঁয়াজ গ্রহণে পাকস্থলী এবং পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। পাকস্থলীতে সাধারণভাবে পরিপাকের কারণে নাইট্রোসামিন নামক যে-কারসিনোজেন উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলিকে নষ্ট করে দেয় পেঁয়াজ এবং রসুন।

হলুদের মধ্যেও রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধক যৌগ, যার নাম কারকিউমিন প্রতিরোধ করে। সবুজ চায়ের মধ্যে পাই ক্যাটেচিন্স্ (Catechis) নামক ক্যান্সার প্রতিরোধক পদার্থ। আঙুরের মধ্যেও থাকে ক্যান্সার প্রতিরোধক রাসায়নিক, নাম রেসভেরাট্রল (Resveratrol), যা লসিকাগ্রন্থি, পাকস্থলী এবং স্তন ক্যান্সার সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

আঁশ বা ছিবড়েযুক্ত খাদ্য : 1960 সালে র্জজ ওয়েটেল (George Oettle) নামক একজন গবেষক প্রথম আমাদের জানালেন যে, আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণের সঙ্গে বৃহদন্ত্র (Colon) ক্যান্সার কমে যাবার এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় একেবারে প্রত্যন্ত

গ্রামে বান্টু উপজাতির উপর গবেষণা করছিলেন। এরা প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত খাদ্য খেয়ে থাকে। চিকিৎসক ডেনিস বার্কিট (Denis P. Burkitt) উগান্ডায় দেখলেন যে, সেখানকার মানুষ প্রচুর পরিমাণে আঁশ আছে এমন খাদ্য খায় বেশি। এদের খাদ্য তালিকায় চীনাবাদাম (ground nut), মিষ্টি আলু (Sweet potato), রাঙা আলু (Yams), কলা, ছালসহ প্রচুর শাকসবজি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় প্রতিদিন আঁশ বা তন্তুর পরিমাণ থাকতো 50 থেকে 250 গ্রামের মতো। লক্ষ্য করলেন, এদের বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার হয় না বললেই চলে। প্রচুর আঁশযুক্ত খাদ্য খাওয়ার কারণে এদের খাদ্য গলাধঃকরণ করা থেকে পায়খানা করার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও অনেক কমে যায়। আর এই কারণে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে শক্ত বর্জ্য পদার্থ খুব বেশিক্ষণ অবস্থান করার সুযোগ পায় না। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত কিছু পদার্থ, যা শরীরে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে, সেগুলি খুব তাড়াতাড়িই শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়।

খাদ্যে অবস্থিত চর্বিজাতীয় পদার্থের সহায়তায় পৌষ্টিক নালীতে অবস্থিত জীবাণুগুলি পৌষ্টিক নালীর ভিতরে প্রচুর ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ বা কারসিনোজেন তৈরি করে ফেলে। এই কারসিনোজেন এবং শরীরের পিত্তরসের Bile acids উভয় মিলেই বৃহদন্ত্রে সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নেয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ওই উপজাতি মানুষগুলির ক্ষেত্রে এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলি খুব তাড়াতাড়ি শরীর থেকে নির্গত হয়ে যাচ্ছে তো বটেই, এমনকী পায়খানার পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে এগুলি অনেকটাই লঘু হয়ে যাচ্ছে।

কি করবেন আর কি করবেন না :

(১) খাদ্যবস্তু বেশি জলে ডুবিয়ে রান্না করবেন না। যত কম জলে রাঁধবেন, ভিটামিন-সি তত বেশি খাদ্যে ধরে রাখা সম্ভব হবে। এই কারণে ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্যবস্তু যেমন, আলু, বাঁধাকপি, সবুজ ফুলকপি, পালং শাক ইত্যাদি খুব অল্প জলে, অল্প সময় ধরে রাঁধতে হবে। এছাড়া ভিটামিন-সি বাতাসে খুলে রাখলেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

(২) চেষ্টা করুন খাদ্যবস্তুকে না কেটে গোটা রেখে রাঁধতে। রাঙা আলু গোটা রাঁধলে 89% ভিটামিন-সি ধরে রাখা যায়।

ক্যান্সার প্রতিরোধী খাদ্য— নির্দেশাবলী :

(১) এমন সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন যাতে শরীরের ওজন স্বাভাবিক থাকে। (২) অতিরিক্ত ক্যালোরি প্রতিদিন কমিয়ে স্বাভাবিক করুন। (৩) চর্বিজাতীয় খাদ্য কম করে খান। (৪) বেশি করে মাছের তেলসহ মাছ খান, যেখানে প্রচুর ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। (৫) পোলট্রির মাংস খান চর্বি ছাড়া। (৬) রেডমিট খাওয়া কমিয়ে ফেলুন। (৭) প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত খাদ্য খান। প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন হয় 25 থেকে 35 গ্রাম আঁশ বা ছিব্ড়ে। (৮) প্রতিদিনকার খাবারে রাখবেন ফল, মূল, শাকসবজী, শস্য, খাবার, যাতে অবশ্যই থাকবে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। (৯) অত্যধিক লবণ এবং খাদ্য সংরক্ষক ও সংযোজক ত্যাগ করুন। (১০) অতিরিক্ত ঝলসানো খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। (১১) কফি কম খান, চা খেতে পারেন। (১২) মদ্যপান একেবারে কমিয়ে ফেলুন। (১৩) অত্যাধিক গরম অবস্থায় কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না।

E-mail : sankarku_nath@yahoo.co.in • M. : 9433309056

সংবাদ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

❑ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। চাকদহ পৌর মুক্ত মঞ্চ থেকে চাকদহ বাসস্ট্যান্ড হয়ে থানার মোড় পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করে চাকদহ পৌরসভা। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পৌরসভার পক্ষ থেকে এক প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাসটিক ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার না করার আবেদন জানানো হয়। পাশাপাশি থার্মোকলের থালা, কাপ, গ্লাস ও প্লেট ব্যবহার না করে পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করার আবেদন জানানো হয়। ৬৫ ডেসিবেলের ওপর শব্দবাজি ও ডি.জে.-এর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার কথা প্রচারপত্রে বলা হয়েছে। পদযাত্রায় সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

❑ ৫ জুন বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে সকাল ৭ টায় পরিবেশ রক্ষায় এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। জলা বাঁচাও, গাছ বাঁচাও ও পরিবেশ বাঁচাও শীর্ষক প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সাইকেল র‍্যালি পোস্টার ব্যানার সহ বাগমোড়, হালিশহর, সরকার বাজার হয়ে আবার কাঁচরাপাড়া স্টেশনে এসে সমাপ্তি হয়।

❑ হরিণঘাটা কোটনিস কমিটি ও অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটির উদ্যোগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নির্মল বাতাস ও দূষণ মুক্ত পৃথিবীর জন্য এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা হরিণঘাটা ও জাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে।

❑ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বারাকপুর ফ্রন্ট লাইন সোসাইটি, গান্ধি মেমোরিয়াল ও পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ যৌথভাবে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকালে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অঙ্কন ও শ্লোগান লেখানো হয়।

গ্রিন কর্ণার সভা

১, ২৯ এপ্রিল ও ৩ জুন বারাকপুর স্টেশনে ১ নং প্লাটফর্মে পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর-এর উদ্যোগে গ্রিন কর্ণার সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবেশের বিপন্নতার কথা বিভিন্ন বক্তারা তুলে ধরেন।

জানো কি?

বিজয় সরকার

কাঠঠোকরার মাথাব্যথা হয় না কেন?

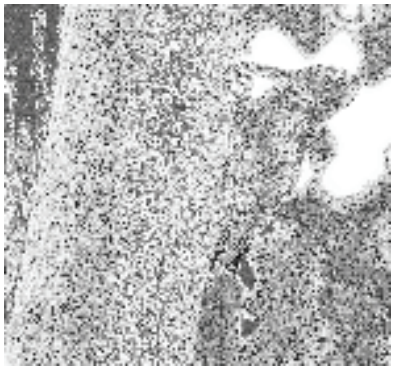

এমন তোমরা অনেকেই দেখেছ যে কাঠঠোকরা গাছের ডালে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করছে। যার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ অনেক দূর থেকেও শোনা যায়। কাঠঠোকরা এক সেকেন্ডে কুড়ি বার ডালে আঘাত করতে পারে। অথচ তার মাথায় কোন ক্ষতি হয় না। এর কারণ হল কাঠঠোকরা হেলমেটের মতো এমন এক খুলি নিয়ে জন্মায়, যে খুলিটি শক্তিশালী ও জমাট মাংসপেশি এবং স্পঞ্জের মতো হাড় দিয়ে তৈরি। কাঠঠোকরার শরীর এমন বিশেষভাবে তৈরি যা ঐ প্রচণ্ড আঘাত সামাল দিতে পারে। কাঠঠোকরার গলার ঘনসন্নিবদ্ধ মাংসপেশির সঙ্গে চঞ্চুর সংযোগ যায়। আর মাথার খুলির স্পঞ্জের মতো হাড় অভিঘাত ঠেকাতে গদির মতো কাজ করে।

জেট প্লেনের পেছনে সাদা ধোঁয়ার লেজ কেন দেখা যায়?

দূর আকাশে জেট প্লেনের পেছনে যে সাদা ধোঁয়া তোমরা দেখ তা আসলে ধোঁয়া নয়, বরং তা হল জলীয় বাষ্প। জেট প্লেনের ইঞ্জিনের জ্বালানী যখন পোড়ে, তখন জ্বালানীর হাইড্রোজেন ও বাতাসের অক্সিজেন মিলে জলীয় বাষ্প তৈরি হয়। এই জলীয় বাষ্প যখন প্লেন থেকে বেরিয়ে আসে, গরম থাকে, তাহলে ওই জলীয় বাষ্প বাতাসে দ্রুত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু জেট প্লেন যে উচ্চতায় ওড়ে, সেখানে বায়ুমণ্ডল অনেক বেশি ঠাণ্ডা, ফলে বাষ্প বাতাসে মিলিয়ে যেতে সময় নেয় অনেক বেশি। এই কারণেই তোমরা জেট প্লেনের পেছনে সাদা ধোঁয়া অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাও। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখবে যে সাদা ধোঁয়ার লেজ এবং প্লেন এই দুয়ের মাঝে বেশ কিছুটা স্থান ফাঁকা রয়েছে। এর কারণ হল, ইঞ্জিন থেকে যখন গরম বাষ্প বের হয়, তা জমতে যেটুকু সময় নেয়, তার মধ্যে প্লেন আরও এগিয়ে গেছে, ফলে তৈরি হয় শূন্যস্থান।

M. : 9432335882

ডার্ক এনার্জি : কতটা প্রাসঙ্গিক?

রতন দেবনাথ

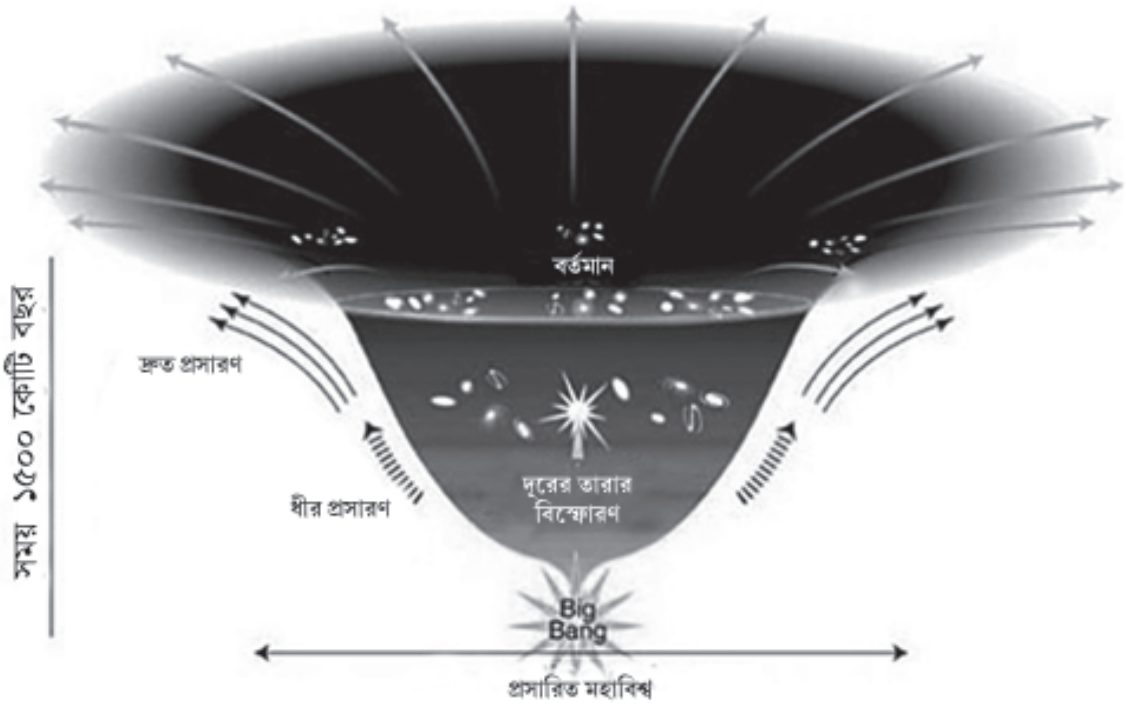

অনেক অনেক কাল আগে মানবসভ্যতার শুরুতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি ছিল খুবই ছোট। উপরে আকাশ আর নীচে পৃথিবী এই নিয়েই ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সময়ের গতিতে জ্ঞানের পরিধি যত বেড়েছে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তিও বেড়েছে তত। ওপরের আকাশে ধরা পড়েছে মহাজাগতিক বস্তু। পৃথিবীর স্থান হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের এক ছোট্ট পরিসরে, সৌরজগতের ছোট এক অংশ হিসাবে। সৌরজগতও তার আধিপত্য হারিয়ে স্থান পেয়েছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নগন্য সদস্য হিসাবে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি নিয়েই আজকের ব্রহ্মাণ্ড।

ক্রমপ্রসারমানতা ব্রহ্মাণ্ডের এক স্বতস্ফূর্ত স্বতপ্রণোদিত বিষয়। ১৯২৯ সালে এডুইন হাব্‌ল ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমপ্রসারমানতার বিষয়টি পরীক্ষালব্ধ ভাবে প্রমাণ করে দেখান। ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমপ্রসারমানতা বিষয়টি কেমন? ব্যাপারটা এরকম : একটা চুপসানো রবারের বেলুনের গায়ে কালো কালি দিয়ে কতকগুলো বিন্দু এঁকে বেলুনটিকে ফোলানো হতে থাকলে দেখা যাবে বিন্দুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বেলুনটিকে যতই ফোলানো হবে বিন্দুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ততই বাড়তে থাকবে। ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমপ্রসারমানতা বিষয়টিও ঠিক এ রকম। ব্রহ্মাণ্ডেও গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডকে করে তুলছে ক্রমপ্রসারমান। এডুইন হাব্‌লের আগে বিষয়টিকে তাত্ত্বিক ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বিজ্ঞানী এ এ ফ্রীডম্যান। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে অবলম্বন করে ফ্রিডম্যান দাঁড় করিয়েছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের এমন এক মডেল যেখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছিল ব্রহ্মাণ্ডের সতত অস্থিরতার। ফ্রীডম্যানের মডেল থেকে এটাও দেখা গেছে যে গ্যালাক্সি সমূহের পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়ার বেগ তাদের মধ্যেকার দূরত্বের সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ পারস্পরিক দূরত্ব যত বাড়বে তাদের বেগও বাড়বে সমহারে। পরীক্ষামূলক ভাবে সেটাও দেখানো গেছে হাবলের পরীক্ষায়।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল নক্ষত্রের বিস্ফোরন বা সুপারনোভা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমপ্রসারমানতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পর থেকেই জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা একটা ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন যে ঠিক কতটা বেগে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের ধারনা ছিল মহাকর্ষীয় বল অর্থাৎ যে বলে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তার প্রভাবে গ্যালাক্সিগুলোর পারস্পরিক বেগে ভাটা পড়ার কথা। ১৯৯০ সাল। সত্যিই বেগে ভাটা পড়ছে কিনা তা পরখ করে দেখতে নেমে পড়লেন দুটি স্বতন্ত্র জ্যোতিঃ-পদার্থবিদের দল। নজর রাখলেন নক্ষত্রের বিস্ফোরণের দিকে। আশ্চর্যজনক ভাবে তারা দেখলেন ক্রমপ্রসারন বেগ তো কমছেই না বরং বেড়েই চলেছ। সিদ্ধান্ত করলেন, নিশ্চয়ই মহাকর্ষ বলের প্রভাবকে কাটিয়ে বেগ বাড়িয়ে তুলছে নতুন কোন শক্তি। জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা সেই শক্তির নাম দিলেন 'ডার্ক এনার্জি'।

ক্রমপ্রসারমান ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবর্দ্ধমান বেগের নিয়ন্ত্রক হিসাবে ডার্ক এনার্জি কে ঢাল করে সমস্যার সাময়িক সমাধান তো হল। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণা থেমে থাকে না। আর কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বার বার চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ডার্ক এনার্জিও তার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় ডার্ক এনার্জিকে তেমন আমল দিচ্ছেন না জ্যোতিঃর্বিজ্ঞানী মহল। ক্রমপ্রসারমান ব্রহ্মাণ্ডের নিরন্তর বেড়ে যাওয়া বেগের কারণ হিসাবে ব্রহ্মাণ্ডের ঘনত্বের অসম বণ্টনের কথাই ভাবছেন বিজ্ঞানীর দল। ডার্ক এনার্জি তাহলে কি শুধুই হেঁয়ালি?

E-mail : rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18

Kanchrapara Albatross School

Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

Dulux
Let's colour

NEROLAC
HEALTHY HOME PAINTS

Authorised Dealer :

SUBINOY PAUL

M. 9231545191
Workshop Road : Kanchrapara, North 24 Pgs.

সৌজন্যে :

BUNTI TRADERS & ORDER SUPPLIERS

Halisahar, Khasbati, North 24 Parganas
ALL PAINTS DEALER

DYNAMIC CARRIER

M : 9883704778
9038000253

(Coaching Centre)

(XI-XII ও স্নাতক স্তর পর্যন্ত)

শিক্ষক : **পরেশ রায়** ১১১, নেতাজী সুভাষপথ, কাঁচরাপাড়া
বিষয় : **ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান**
শিক্ষিকা : **নন্দিনী দাস**
বিষয় : **বাংলা ও ইংরেজি**

With Best Compliments :

M/S SAHA ENTERPRISE

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Prop. Nitai Saha

Vill & P.O. Simhat
District : Nadia
PIN : 741249
Mobile : 9732552485

"BIGYAN ANNESWAK" VOL : 14 Issue No. 3 May-June 2017 WBBEN/2003/11192 Rs. 5

শব্দের খোঁজে ১ : পাখি

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১			২		৩		৪	
		৫		৬				
৭						৮		৯
		১০			১১			
১২							১৩	
			১৪		১৫	১৬		
১৭	১৮							
					১৯			২০
২১			২২					

◆ **পাশাপাশি :**

(১) শুক _____। (৩) কুচবিহার অন্তর্গত (এক জলাশয়) পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল, রঙ্গ _____। (৫) তাম্বুল অবগাহন পাখি। (৭) স্ত্রী পায়রা। (৮) টুনটুনি পাখি যা, খুব ছট্‌ফটে। (১০) পাখিটি সাহিত্যিক বনফুলের নামাঙ্কিত, অঞ্জন। (১২) সমগ্র পাখিকুলের দেহ আবরণ। (১৩) কাস্তে _____ পাখি, (বিচরণ করা)। (১৫) পাখিটির প্রথম অক্ষর নঅর্থক (Negative), শেষ দুইটি কাটা _____। (১৭) সীতাপতি কলহ প্রবন পাখি। (১৯) বিদ্যুৎ বাহি পুচ্ছ পাখি। (২১) _____ বোলা পাখি, হরির দোসর। (২২) এই পাখিটিকে ইংরাজতে 'Tree Duck' বলা হয়।

◆ **উপর নীচে :**

(১) _____ খোল, শক্ত আবরণযুক্ত জলজ প্রাণী বিশেষ। (২) _____ মুরগি। (৩) 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর...'। ঠাকুর কবি। (৪) ময়ূর পুচ্ছ। (৫) ছোট লেবু বায়স। (৬) ঘুঘু বিশেষ, প্রথম অক্ষর ইংরাজিতে করা কে বোঝায়, শেষ দুই নদীর দুধারে থাকে। (৮) চখা _____। (৯) একটি পাখি, প্রথম অক্ষর ইংরেজিতে আইন, শেষ দুই আফগান শহর _____ বোরা। (১১) এর সাহায্যে পাখিরা উড়তে পারে। (১২) কবুতর। (১৩) পাথুরে _____ পাখি, সরাইখানা। (১৪) পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতির হাঁস, ইংরেজিতে কটন টিল। (১৬) এর নির্বিচার চালনায় পাখির বাসস্থান ও প্রকৃতির ক্ষতি সাধন হচ্ছে। (১৮) ভারতের জাতীয় পাখি। (১৯) _____ চটক পাখি, _____ পাতার সেপাই। (২০) লোহা _____ পাখি। নেপাল দেশের এক সম্মানীয় উপাধি বিশেষ।

সব নদীর এক দাবী

জগন্ময় মজুমদার

সব পাখিতে মাছটি খায়
নামটি হয় মাছরাঙার
মাছরাঙা সেই নন্দ ঘোষ
না থাকলেও তার-ই দোষ।

ধরতে গেলে যায় পিছলে
যে কোনো মাছ নয় পাকাল
তবুও তার পাঁক শরীরে
সবাইকে সে করে নাকাল।

সব নদীতেই পড়ে চড়া
একটু বেশি একটু কম
সব নদীতেই ভাসে মড়া
সব বাড়িতেই আসে যম।

কোন্ নদীতে কে ফেলে না
অ্যাসিড-পানি কারখানার?
গঙ্গা কেবল একলা নয়
সব নদীতেই তার প্রহার।

রুখতে যদি সত্যি হয়
সব নদীর-ই এক দাবী
নদী মানেই আরেক মা
মা-যে আমার খাচ্ছে খাবি।

নদী বাঁচাও বলি না আর
বাঁচাও মা'র প্রাণ-প্রবাহ
আর বলি না বাঁচাও নদী
বাঁচাও মায়ের প্রাণ আবহ।

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
M. 9332283356
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব
M. 9232387401
প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা
M. 9732681106
কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
M. 9477589456
তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার
M. 9733153661
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম
M. 9434686749
গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ
M. 9593866569
বুক মার্ক, বৈচিত্র্য ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in